KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2005	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল - ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৬০/১ ৬০/২	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৭ || Aug 2000 কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪০৭ || Dec 2000
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬০ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একুশটি অপ্রকাশিত কবিতা - ভূমেন্দ্র গুহ - .. ভূমিকা সহ।

আসন্ন দেশবিভাগ পর্বে বাঙালি মুসলিম জীবনধারার স্বরূপ-সন্ধানী গৌরকিশোর ঘোষের ত্রয়ী 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রতিবেশী' এবং বিশেষ করে 'প্রেম নেই' উপন্যাসটি নিয়ে ড. বিজিতকুমার দত্তের অনুপুঙ্খ বিচার।

'বাংলা উপন্যাসে স্বল্পালোকিত অন্য এক সমাজ' নিবন্ধে অধ্যাপিকা বন্দনা রায় প্রশ্ন তুলেছেন, শহরবাসী আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের জীবনচিত্র রচনায় লেখকদের অনাগ্রহ কেন?

ধারাবাহিক 'আলোছায়ার পথিক' : মুম্বাই থেকে কলকাতা এসে তাপস সেনের বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গ এবং নাট্যমঞ্চে আলোকসম্পাতে নব নব উদ্ভাবনের রোমাঞ্চকর দিনগুলির কথা।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র ধারাবাহিক 'বঙ্গসংহার এবং' : এই কিস্তিতে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সূচনাপর্ব।

গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শের বিকৃতির রূপরেখা ড. রেণুকা বিশ্বাসের রচনায়।

রবীন্দ্রচর্চায় সজনীকান্ত দাসের বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে সন্দর্ভ-জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

'কবিমানসী' নতুন করে পড়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্র অভিমত।

চেতনা-র 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' সমালোচনায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

With Best Compliments of :

Cable : ALMETAPAP

ASSOCIATED TRADERS

MANUFACTURERS ♣ DEALERS ♣ CONTRACTORS

1, NRITYA GOPAL GHOSAL ROAD
ARIADAHA, , CALCUTTA 700 057.
PHONE : 564-7768 & 564-6284

CITY OFFICE : 244-4283

CALCUTTA ♣ MUMBAI

Please enquire for :

High & Low purity Aluminium Ingots, Alloy Ingots of all descriptions, Notched Bars, Shots, Cubes for Steel Founderies, Gravity & Pressure Die Castings for Electrical & Engineering Industries.

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭
বর্ষ ৬০ সংখ্যা ১

- অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ — সঞ্জয় ভট্টাচার্য — ৯

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

- আলোছায়ার পথিক — তাপস সেন — ১৩
- বঙ্গসংহার এবং — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ২০

- এমনভাবে — শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় — ২৭
  - বিনি-ছুঁচে ফোঁড়া — দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৮
  - এই পদ্মায়—রবীন্দ্রনাথ — দেবী রায় — ২৯
  - অঙ্গার — অনিতা অগ্নিহোত্রী — ৩০
  - সামাজিক — মতি মুখোপাধ্যায় — ৩১
  - বিকল্প — নীলাঞ্জন সিংহ — ৩২
  - অপেক্ষা — পার্থপ্রতিম মন্ডল — ৩৩
  - বুকুল পিসি — সাগ্নিক দেব — ৩৪

- গৌরকিশোর ঘোষের ত্রয়ী — বিজিতকুমার দত্ত — ৩৫
- বাংলা উপন্যাসে স্বল্পালোকিত অন্য এক সমাজ — বন্দনা রায় — ৪৫

গল্প

- মানুষের কী রইল — বিজনকুমার ঘোষ — ৫০
- কীর্তিমুখ — পীযূষ ভট্টাচার্য — ৫৫

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

- সজনীকান্তের রবীন্দ্রচর্চা — সর্বানন্দ চৌধুরী — ৬০
- ডেমোক্রেসি ও আমরা — রেণুকা বিশ্বাস — ৬৪
- উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'বিটা' — সুরজিৎ দাশগুপ্ত — ৬৮

গ্রন্থসমালোচনা — ৭১

- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ✧ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ✧ মীরাতুন নাহার
- মধুময় পাল ✧ অসীম রেজ ✧ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
- অভিজিৎ দত্ত ✧ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ✧ মেঘ মুখোপাধ্যায়

নাট্যসমালোচনা

- চেতনা-র তিস্তা পারের বৃত্তান্ত — প্রেমেন্দ্র মজুমদার — ৮৭
- স্মরণ : মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার — রেণুকা বিশ্বাস — ৯১
- চিঠিপত্র — ৯৪

মূল্য : ১৫ টাকা
ডাকে : ১৮ টাকা
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে— নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা—৬

দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রউফ

—এই যে জ্যেঠামশাই, চা বলি?

—না, থাক। আজ বাজার করতে নয়। এমনি বেড়াতে এসেছি।

—ভাল।

সমীর ছেলেটা খুব হাসিখুশি। সুনীলবাবু খবরের কাগজ দিয়ে শুরু করলেন, যাক, কার্গিলের যুদ্ধটা থেমে গেল। ছবিতে দেখলাম পাক সৈন্যরা মর্টার, রাইফেল নিয়ে পিছু হঠছে।

—খুব ভাল হল জ্যেঠামশাই। যুদ্ধটা আরও কিছুদিন চললে দেখতেন জিনিসের দাম কোথায় পৌঁছত।

—গরিবগুর্বো মরত। আর কী হত?

—যা বলেছেন।

—শোন সমীর—মরার কথায় প্রসঙ্গটা চট করে এসে গেল : কাঁদিন আগে কদম গাছে একটা ছেলেকে বেঁধে কারা পেটাল?

ইতিমধ্যে দোকানে একটি উঠতি মেয়ে ঢোকে। নানা রঙের লিপস্টিক নাড়াচাড়া করে একটি পছন্দ করে। খুচরো ফেরত দিয়ে সমীর বলল, হ্যাঁ, একটা গণ্ডগোল শুনেছিলাম বটে। কিন্তু দোকান ফেলে তো যেতে পারি না। গত বুধবার কী হল জানেন না? একটা লোক এসে একশো ডিম চাইল। এক্ষুনি দিতে হবে। আপনাকে বলে রাখি জ্যেঠামশাই, দোকানে এখন ডিমও থাকে। তো পেছনের দিকে গেছি ডিম আনতে, বড় জোর দু' মিনিট, এসে দেখি লোকটা নেই। আমার সাইকেলও নেই। ছুটে বেরিয়ে গেছি। কোথায় কে? পগার পার। আমার বড় শালা প্রেজেন্ট করেছিল। দারুণ দেখতে সাইকেলটা—

দুঃখু দুঃখু মুখ করে সুনীলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এখন কেবল সাইকেলের গল্পই চলবে। একটু এগোতেই দেখা হয়ে গেল ফরেন সার্ভিসের ভদ্রলোকের সঙ্গে। প্রথমে একটু খাজুরি আলাপটা জুড়ে দেন, পোস্ট অফিস থেকে এলেন বুঝি?

—না। আমি তো সতেরো তারিখে যাই। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

—পোস্ট অফিসেই দেখেছেন। আপনি তো ফরেন সার্ভিসে

ভদ্রলোক এক গাল হেসে দিলেন, এই কদমগাছের ছায়ায় আসুন। বছর তিনেক দেশে, ট্রেনিং পিরিয়ড বলতে পারেন, তারপর তো বিদেশেই কেটে গেল চাকরিজীবন—

—হিংসে হয়। আপনার কত অভিজ্ঞতা।—সুনীলবাবু চোখ বড় করলেন।

—তা খুব—ভদ্রলোকের মুখে খুশি আর ধরে না—নায়েগ্রার ফলস দেখেছি, প্যারিসে লুভর মিউজিয়াম, ইজিপ্টের পিরামিড, বলশই থিয়েটার—

সুনীলবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আচ্ছা, সেদিন এই গাছের সঙ্গে একটা ছেলেকে বেঁধে—

ভদ্রলোকের দুটো চোখই ছোট আর কুতকুতে হয়ে গেল, আপনি মশাই বেরসিক। আরও কত কী বলার ছিল। হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তাতে কী হয়েছে? আমার মাথা তো খারাপ হয়নি। চলি —

সুনীলবাবু দ্রুত গমনভঙ্গি দেখতে পেলেন।

রাতে যথারীতি অনিদ্রা। কেবলই মনে হতে লাগল আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উনি সে রকমই ইঙ্গিত দিলেন। ছেলেটাই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এখানেই কেন মরতে এল হতভাগা? আরও তো অনেক বাজার ছিল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। তিনটে বেজে দশ। মেঝেতে উবু হয়ে ডায়েরিখানা পড়ে আছে। সুনীলবাবু ভেবেছিলেন আর লিখবেন না। কিন্তু চল্লিশ বছরের অভ্যেস ছাড়া অতই সহজ? ফের কুড়িয়ে নিলেন। রাত তিনটে আঠারো মিনিটে ভিতর থেকে একটি লাইন বেরিয়ে এল, মানুষের কী রইল?

গল্প

কীর্তিমুখ

পীযূষ ভট্টাচার্য

বিষ্টি নামার পূর্বমুহূর্তের চাপা স্নিগ্ধতায় টইটম্বুর চতুর্দিক। মেঘলা আকাশ জল-জলভর্তি চৌবাচ্চায় একপশু জলীয় বাতাসে ঢেউ খেলবার প্রয়াসের ভিতর মাছগুলি বুঝে নিতে চাইছে জমাট মেঘের অন্ধকার কতদূর? কিন্তু এতসব কিছুই তো জমিয়ে বৃষ্টি শুরু হবার ইঙ্গিত। বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে অনেক কাজ শান্তনুর—চৌবাচ্চায় নেট বিছানো, চৌবাচ্চার নীচের কল খুলে কিছু জল বের করে দেওয়া যাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায় চৌবাচ্চায়। এ সব ভাবতে ভাবতে রহস্যাগন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে আবার বিষণ্ণ হয়ে যায়।

গীতিকে ওরাই পাঠিয়েছিল না নিজেই এসেছে? গীতির অবশ্য এতক্ষণে বাস স্টপে পৌঁছে যাবার কথা টানা দু'মাইল হাঁটবার পর। গীতি কি বাড়ি পৌঁছে টিভি খুলে জেনে নেবে বাতাসে কত শতাংশ আর্দ্রতা আজকে? বৃষ্টির গনঘটা কতদূর পর্যন্ত ব্যপ্ত হবে? গীতি কিন্তু এমনভাবে এসেছিল যেন কোনও প্রশ্নের মীমাংসার তাড়না ছিল। প্রায় আট ন'বছর ধরে তৈরি হওয়া প্রশ্ন যে কীভাবে উপস্থাপনা করতে হয় তার রীতিনীতি না জানায় জনাই যেন করা হল না প্রশ্ন। কিন্তু শান্তনু যেমন এ-মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছে না মানুষের প্রত্যাবর্তনের কোনও কি নির্দিষ্ট দিশা আছে? কিন্তু যে ব্যক্তি উঠোনের সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে তাকে ঘরে ঢুকতে বলার গার্হস্থতা হারিয়ে গীতি এতটাই নিশ্চল ছিল যে শান্তনুকে বলতেই হল—'ছাড়া পেয়ে চলে এলাম।'

মায়ের আড়ালে ঝুলনও এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার গ্রিলের ওপারে। বোঝা যাচ্ছে না—ঝুলনের চোখে মুখে কি শান্তনুর প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট দিশা হারিয়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা অবস্থার আবহাওয়ায় তৈরি হচ্ছে—'এ কেমন ফিরে আসা?' কোনও মিছিল নেই, উৎসব নেই, জয়ধ্বনি নেই, নিঃসঙ্গ একাকী ফিরে আসা মেয়েটা তিমির পিঠে দাঁড়িয়ে মাছ ধরবার ভঙ্গিময় দেখছে। তবে কি মায়ের স্মৃতির ধারাবিবরণীতে তৈরি হওয়া শান্তনুর অবয়ব যা অনেকটা পুরনো ফটোগ্রাফির কাঠামো থেকে তৈরি হওয়া একটা মূর্তির অস্পষ্ট ভাব—ভাঙছে আবার এক বৃত্তও তৈরি হচ্ছে মেয়েটার মনের মধ্যে। ভাঙা গড়ার মধ্যে কোনও এক বৃত্তের ভিতর দাঁড়িয়ে তির তির করে কেঁপে উঠে দুই উরুর মাঝ দিয়ে রক্তস্রোত পায়ের পাতা অবধি নেমে আসতেই 'মা' বলে আর্তনাদ করে ওঠে।

গ্রিলের তালা খুলবার জন্য চাবি হাতে গীতি দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছে এই কি তার আর এক সৃষ্টি? যার মুখে এ মুহূর্তে কোনও কথা নেই কেবল তার দিকে তাকিয়ে? হয়ত এই মেয়ে তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতি হয়ে থাকবে। 'স্লেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের শিশু নারী হয়ে যাচ্ছে।' গীতির মুখে অপ্রস্তুতের ছাপ গ্রিলের ছায়ার নকশার জালে আটকে গেলে নীল নিস্তব্ধ চোখে শান্তনুকে আরও একবার দেখে নিয়ে ঝুলনকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভিতর চলে গেল।

শান্তনু আবার গ্রিলের এপারে একা। এতদিন কয়েদখানার গরাদের জং ধরা লোহার গন্ধের ভিতর যেমন সে একা ছিল তেমনই একা গ্রিলের জ্যামিতিক নকশার এপারে।

গীতি এবং ঝুলনের নীরবতা ভীষণ অসহনীয় এই মুহূর্তে বা, বেশ কিছুক্ষণ পর গীতির চাপা গলা শোনা গেল—'ইনি হচ্ছেন তোমার বাবা। তুমি একদম ঘাবড়াবে না সব মেয়েদের এরকম হয়।'

জননী ও কন্যার নিরপরাধ পৃথিবীতে এভাবেই কি ফিরে আসা যায়? বাড়িতে আসবার সময় সে রিক্সার হুড তুলে পর্দা নামিয়ে দিতে বলেছিল। এখন তো রৌদ্রের প্রচণ্ডতা বা বৃষ্টি নেই তবে কেন হুড তুলে পর্দা ফেলতে হবে? রিক্সাওয়ালার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে বলেছিল বৃষ্টি, নামতে কতক্ষণ?

উঁচু এন এইচে বাতাস আটকে যাবার ফলে কিছুটা লাফিয়ে উঠে ঝড় শুরু হয়ে গেলে সে দেখে এখন আর সে রকম বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। গীতি যেভাবে এসেছিল সেভাবেই ফিরে গেছে।

বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা খোলা এখনও, তখনও ছিল—সাধারণত এভাবেই থাকে। যতটা সম্ভব গীতি তার নাগালের মধ্যে ঘুরে ফিরে ছ'সাত ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরে গেছে। ভুলে একবারও ঝুলনের প্রসঙ্গ তোলেনি। ঝুলন কি সেদিন নিজস্ব অন্যমনস্কতার মধ্যে কোনও খুনির শরীরের রক্ত থেকে লবণাক্ত ঘ্রাণ নেবার গোপন প্রয়াসে নিমগ্ন ছিল?

গোপন প্রয়াস কেন? ঝুলন জানতে চাইতেই পারে তার বাবা খুনি কি না? দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আইন বাদী বিবাদীর সাক্ষ্যকে ধারাতে বাঁধবার জন্য হন্যে হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় দলবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে হারু ঘোষকে খুন করা হয়েছে। জমি দখলের লড়াই হোক আর শ্রেণী সংগ্রাম হোক অস্ত্র তোমার হাতে থাকলে তোমার রেহাই নেই—তুমি খুনি। শান্তনুর দশবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়। এই একটি ঘটনাই তাকে অনেকের চেয়ে পৃথক করে তুলেছিল এক সময়। সে যেন ঘন অন্ধকার বনে আগুন জ্বেলে পশুদের তফাতে রাখতে পেরেছিল অনেক অনেক দিন। অন্ধকারে তাকালে দেখা যেত আগুনের ওপারে হারু ঘোষদের জোড়া জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু তাতে কী? তারা তো আগুনের সীমানার বাইরে। কখন যে সেই গল্পের পাখির মতন ঠোঁটে করে আগুন অন্যত্র পৌঁছে দেবার জন্য উড়তে উড়তে গায়ে আগুন ধরে যায় বুঝতে পারে না। কিন্তু তখন পর্যন্ত নকুলদা, গীতি এরা জেলে দেখা করতে যেত। তখনও শান্তনুর 'এটা কি কেবল ব্যক্তিহত্যা?' প্রশ্নের উত্তরে নকুলদার উত্তর ছিল। এক সময় এই প্রশ্নের উত্তর নকুলদা না দিয়ে এমন এক জায়গায় দৃষ্টি স্থাপিত করত সেখানে শুধু অতীত।

পার্টি অফিসে টেলিফোন করে এলে গীতি অবশ্য আগে ভাগেই জেনে যেত শান্তনুর আসবার কথা। কিন্তু মেয়াদ শেষ হবার আগে ছাড়া পাবার খবরে এতটাই বিহ্বল ছিল যে কোনও খবর দেবার কথাই মনে হয়নি শান্তনুর। দিন যাপনের গ্লানিতে প্রতিদিন ডুবে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যেত ঝুলনের কল্পিত মুখাবয়ব যা তাকে মাস্তুলের মতন আঁকড়ে ধরবার লোভ দেখাত—অবশেষে তীরে পৌঁছে দেখে সে একা। বন্ধ গ্রিলের ভিতর ঝুলন দ্রুত মহিলায় রূপান্তরিত হয়ে চলছে—গ্রিলের বাইরে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সে। মাথার উপর মরুভূমির মতন বিশাল আকাশের নীচে সে কি একা? একেবারে একা—!

রূপকথার গল্পে যেমন ঘুমাতে চলে যায় অন্দরমহলে রাজকন্যা—ঝুলন কি তেমনভাবে চলে গেল? বাইরে যে তার বাবা দাঁড়িয়ে! মেয়ের নাম ধরেই কি ডাক দেবে শেষ পর্যন্ত? গীতিই বা কেমন তাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভিতর কী করছে? ততক্ষণে গ্রিলের নকশায় পেঁচিয়ে ওঠা লতানো গাছটির ফুলের দিকে নজর গেলে সে মনে করবার চেষ্টা করে, গাছটির কী নাম? এক সময় এর বোটানি নামটুকুও জানত—এ গাছের ফুল চিরকালই পছন্দ গীতির। চিক্ নামালে গ্রিলের ওপারটা ঘরের আদল পেয়ে ড্রয়িং রুম হয়ে যায় প্রয়োজনে। এ রকমই ব্যবস্থা। শান্তনুর সংগ্রহ করে আনা কোনও এক প্রাচীন পাথরের মূর্তির ওপরের কীর্তিমুখ অংশটি এখনও রাখা। আগে অবহেলায় মাটিতে গড়াত এখন সেলফ তৈরি করে এমনভাবে স্থাপিত যে সহজেই রুচির সহজপাঠ হয়ে যায়। গীতি কি জানে কীর্তিমুখ কী? এ তো জীবনের জীবন সংহার করে বেঁচে থাকারই রূপক। নিজেকে পা থেকে খেতে খেতে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে মুখ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর চেয়ে বড় নিদর্শন বুঝি আর কিছুতেই নেই—এ রকম ভাবনার মধ্যে গীতি গ্রিলের তালা খুলে নির্বিকার শান্তনুর দাঁড়িয়ে থাকা দেখতেই থাকে। বাইরের চাতালে কাঠটগর গাছটিতে বসা কাক ডেকে না উঠলে গীতি বা শান্তনুর সংবিত ফিরে আসতে দেরি হত। কেননা তারা দু'জনেই নিজের চারিদিকে ফ্রেম লাগিয়ে চলে যাচ্ছিল অবশ্যম্ভাবী এক স্থিরচিত্রে।

শান্তনু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসবার পর মনে হল সময় আর সামনে এগুচ্ছে না, অদৃশ্য পিছুটানে যেন একই জায়গায় পাক খেয়ে ঘুরছে। অনেকক্ষণ পর গীতির শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা ঢিলে হলে দীর্ঘনিশ্বাসের মতন বলে ওঠে, 'আজই প্রথম তো একদম নারভাস হয়ে গেছে'। ড্রয়ার খুলে টাকা হাতে নিয়ে মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে এক প্যাকেট স্যানেটারি ন্যাপকিন কিনে আনতে বলে শান্তনুকে।

যে রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে সে এসেছে সে রাস্তা এখন ভীষণ অপরিচিত। পরিবর্তনের ছাপে উন্নতির চিহ্ন স্পষ্ট। নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপন রাতে বিজ্ঞপিত হবার অপেক্ষায়। মানুষের প্রয়োজনে রাস্তা প্রশস্ত হতে হতে গৃহস্থের দরজা অবধি পৌঁছে গেছে। মোড়ের জীতেশদার মেডিসিন সেন্টারের মাথায় ছোট্ট করে 'নিউ' লেখা। গীতির সাথে বিয়ের পর এই জীতেশদার দোকানের কাউন্টারের সামনে একদিনে চারবার এসেছিল, চারবারই মাথাধরার টেবলেট কিনেছে, পাঁচবারের বার জীতেশদা সবার সামনেই ধমকে উঠেছিল—'মাথা ধরার টেবলেট হয় না, মাথা ধরা ছাড়াবার টেবলেট পাওয়া যায়। আর একবার মাথা ধরার টেবলেট চাইলেই মাথা কেটে ফেলব। বিয়ে করেছিস যখন কী চাইছিস বুঝি' বলে হাত চেপে ধরে আবার বলেছিল—'এত লজ্জা পেলে বিপ্লব করবি কী করে?'

জীতেশদা তার থেকে বড় জোর সাত আট বছরের বড়। তাঁর ছবি চন্দন দিয়ে মালা আঁকবার প্রয়াস নিয়ে টাঙানো। এঁর কাছে যতবার গীতির ছোটখাটো মেয়েলি প্রয়োজনে এসেছে সানন্দে পরামর্শ দিয়েছেন। ঝুলনের সময় বলেছেন, 'ডাক্তারের কাছে যাবি'। স্যাম্পেল ফাইল ডেকে দিতেন—'এটা বউমাকে ঠিক মতন খাওয়াবি।' শরীরের খোঁজ খবর নিতেন। শেষ কী কথা হয়েছিল মনে করবার চেষ্টা করে শান্তনু। কোর্টের রায়ের পর ভ্যানে তুলবার

সময় মানুষটাকে শুধু হাত নাড়তে দেখেছিল। সব কথা বোঝবার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না। চোখের ভাষাই যথেষ্ট। তার সহকর্মীদের যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকার হেতুতে বেকসুর খালাস হয়ে যাবার উত্তেজনার মধ্যে মুহূর্তের জন্য অসহায় ভাবে সে জীতেশদাকে দেখেছিল—জীতেশদার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল—'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শান্তনুকে এ ভাবে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সপ্রতিভ একটি ছেলে এগিয়ে এলে জীতেশদার ছবি থেকে চোখ না তুলে স্যানেটারি ন্যাপকিন দিতে বলে। যে বস্তুটি এতক্ষণ কাঁচের শো কেসের ভেতর সর্বসমক্ষে খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছিল মুহূর্তের মধ্যে গোপনীয়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে কারও প্রয়োজনে আসবার জন্য। সেটিকে বাসি দৈনিকের মোড়কে বেঁধে কালো পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে মূল্য বুঝে নেয় ছেলেটা। শান্তনু জীতেশদার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস না করে চলে আসে। বাড়িতে ততক্ষণে গীতি শান্তনুর পুরনো জামা কাপড় আলমারি থেকে বের করবার ফলে চতুর্দিকে তীব্র ন্যাপথলিনের গন্ধ—শান্তনু ঘরে ঢুকেই টের পায় তা।

গীতি যখন এ বাড়িতে ঢুকেছিল তখন দেখে সমস্ত দরজাই হাট করে মেলে ধরা এবং এতটাই স্তব্ধতা যে অপ্রাকৃতিক মনে হয়। শান্তনু তখন মাছেদের গোত্র ভাগ করতে এতই ব্যাপৃত ছিল যে গীতির গরম নিঃশ্বাস ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়তেই সে মাছটির কানকোর ঠিক নীচের অংশে উল্টো দিকে হাত চালিয়ে আঁশের মসৃণতায় বুঝে নিতে চাইছিল মেয়ে মানুষের জাতের কিনা, কিন্তু কখন যে মাছটি তার মসৃণতা নিয়ে হাতের চাপে নিঃসাড় হয়ে যায় সে বুঝতেই পারে না। 'বাব্বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি টেরই পাচ্ছ না'—গীতির কথাতে সংবিত ফিরে মাছটিকে জলের ভিতর ছেড়ে দেয়—জীবনের কোনও লক্ষণ নেই শুধু চৌবাচ্চার পরিষ্কার জলের ভিতর মাছটির শরীর তলিয়ে যাবার পথ প্রাকৃতিক নিয়মেই তৈরি হয়ে গেল। গীতির শরীরের ঘামের ভিতর খুউব চেনা পারফিউমের যে গন্ধটা ঝিম মেরে থাকত সব সময় হয়ত তা এখনও আছে তা কি সে বুঝতে পারছে না! তবে কি আট ন'বছরে অনেক কিছুই ঠিকঠাক থাকে না। সে খুবই স্থির ভাবে মাছটির দিকে লক্ষ করে দেখল এখনও কোনও জীবনের স্পন্দন তৈরি হচ্ছে না অথচ অন্যান্য মাছেরা নির্বিকারে জলের মধ্যে নতুন নতুন পথ অবলীলায় তৈরি করে যাচ্ছে। সে শুধু মাছেদের লিঙ্গের প্রভেদ অনুযায়ী পৃথকীকরণ করছিল। এক জায়গায় একই ভাবে থাকলে সহোদর সহোদরার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যৌনতা কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এ সব ভাবনার মধ্যে গীতির দিকে তাকিয়ে সাবধান হয়ে গেল—কেননা সে বুঝতে পারছে না গীতি নিজে এসেছে না কেউ পাঠিয়েছে?

বহরমপুর জেলে বদলি হবার পর গীতি একবার দেখা করতে এসেছিল অবশ্য গীতি চাকরি পেয়ে গেছে ততদিনে। নকুলদা সেবারও গীতির সঙ্গে ছিল। শান্তনুর সেই একই প্রশ্ন ব্যক্তিহত্যা না শ্রেণীসংগ্রাম না করায় নকুলদা বলেই ফেলে কোন, স্কুল জিজ্ঞেস করলি না?

—স্কুল যাই হোক সিলেবাস তো একই।

এ কথার উত্তরে নকুলদা কী বুঝল কে জানে—কিন্তু তাদের দু'জনকে একা থাকতে দিয়ে বাইরে চলে যায়। তখনই গীতিকে বিষুবীয় অরণ্যের বৃক্ষ বলে মনে হয়। কেটে ফেলা বৃক্ষগুড়ি থেকে আবার জন্ম নিচ্ছে সেই বৃক্ষ যা উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে। গীতিই একসময় বলে ওঠে—তুমি খুশি তো?

শান্তনু জানে এ ক্ষেত্রে কোনও বিনিময়ের প্রশ্ন ওঠেনি। যোগ্যতা ছিল, স্কুল কমিটিকে দিয়ে নকুলদারা কাজটি করিয়েছে। কিন্তু আজ তার হঠাৎ মনে হয় এ ক্ষেত্রেও বিনিময় ঘটিয়েছে নকুলদারা কেননা শান্তনু ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরেই নকুলদা চলে এসেছিল বাড়িতে। কোনও রকম ভণিতা না করেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে—'তুই কি এখন এখানে থাকবি?'

শান্তনু ভাবতে শুরু করেছিল নিজেকেই প্রশ্ন তুলে, কেন? কেন সে এখানে থাকবে না? বারবার তার মুখটা বিকৃত হতে হতে মনে হল সে ভয়ঙ্কর কিছু চিবুচ্ছে।

—'তুই হয়ত জানিস না হারু ঘোষের ছেলে সত্য একজন নির্দল সদস্য জেলা পরিষদে। পরিষদে আমরা চার চার—ওর ভোটেই পাওয়ারে—'

নকুলদার কথা শেষ হতে শান্তনু নিঃশব্দে হাসল। তার হাসিটা কিরণের মতন তার চোখের দু'প্রান্ত জুড়ে স্থির হয়ে কিছুটা সময়ের জন্য থেকে আবার স্বাভাবিক। এখন আর নকুলদা শান্তনুর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে না। গীতিকেই বলছে—'এখানে থাকলে পুরনো মানুষজন আসবেই—তখন নানান প্রশ্ন—'

যে কথাটা নকুলদা না বলে চলে গেলেন সেই না বলা কথা—'সত্য ঘোষ চায় না শান্তনু এখানে থাকুক' ঘরের নীরবতাকে আরও গভীরতায় পৌঁছে দিয়েছে। শান্তনু জেলে যাবার পর এ ঘরের পাশে আরও একটি ঘর হয়েছে। যেন ঘরের মধ্যে ঘর অন্যঘর অন্যতর জীবন যা চাঁদের মতন প্রতিমাসে মরে যায় আবার বেঁচেও ওঠে। মাত্র কয়েকদিনের মৃত্যুতে কিছু কি হেরফের হয় চাঁদের? সে তো স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারে আবার। গীতি কিছু বলবার আগে সে বলে ওঠে—গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। 'বাবা মারা যাবার পর তো তালা বন্ধ' গীতির উদাসীন কথার উত্তরে শান্তনু শুধু বলতে পেরেছিল—'বেদখল তো হয়নি'।

অনেক সময় নীরবতা ভীষণ সংক্রামক হয় এবং তা ঝাপিয়ে পড়ে আক্রান্ত করেছিল তাদের। তারপর থেকে শান্তনু এখানে—

অনেকটা কুয়াশার ভিতর জবু-থবু হয়ে বসে থাকা যেন! কে যেন সাক্ষী দিতে এসে বলেছিল—হারু ঘোষের নিশানা যদি ঠিকঠাক থাকত ওই ফেলে দিত শান্তনুকে। কোনও কোনও হিংসা এত আইনি হয়ে যায় কৌশলে তা নৈতিক সমর্থনও পায় আত্মরক্ষার প্রশ্নে! আশ্চর্য শান্তনু বেঁচে আছে বলেই কি হত্যাকারী?

প্রাচীন এই আদালতের স্থাপত্য এমনভাবে তৈরি যে প্রতিটি কথা যতই আস্তে বলা হোক না কেন তা স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কাছে। প্রতিধ্বনিহীন এই সব কথা শুনতে শুনতে চোখের পাতায় ক্লান্তির ভার। কিন্তু সচেতন থাকতেই হচ্ছিল যাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে—তাই সে দেখতে পায় প্রাচীন এই আদালতের সঙ্গে বেড়ে ওঠা বটগাছটির সবুজ জঙ্গলে একদল অচেনা পাখির নিঃশব্দ দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া। হারু ঘোষের বন্দুকের আওয়াজে মাঠের মধ্যে মিশে থাকা পাখিরা আকাশে উড়বার আগেই শান্তনু বল্লম ছুড়েছিল—নিশানা এমন অব্যর্থ হবার কোনও শিক্ষাই ছিল না—তথাপি দলনেতা হিসাবে তাকে আঘাত করতেই হত—অমোঘ বিদ্ধ করবার পর সে কিছুটা থমকে পাখিদের আকাশে ওড়াউড়ি দেখেছিল কেন তা আজও বুঝতে পারে না। আহা, তখনই কি তার মনে পড়েছিল 'আঁখির কোণায় পাখির বাসা—দেখতে নারি কী তামসা' লালনের তত্ত্ব-তল্লাশের কথা। যদিও তখন বাইরে ভীষণ রোদ অথচ ঘরের ভিতর মানুষ জনেরা ছায়া ছায়া। এক এক করে ছায়া অন্ধকারে সহে যাওয়া ছায়ামানুষেরা কী বলছিল তা আজ মনে নেই। কেননা চতুর্দিকের কোলাহলের মধ্যে যে নির্জনতার বীজ লুকানো থাকে তাকে তো নিজের সঙ্গে নিভৃত রসায়নে মগ্ন হয়ে অঙ্কুরোদ্‌গম হতে হয়—সে ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল—

বহরমপুর জেলে গীতিকে দেখে শান্তনুর মনে হয়েছিল—কেউ কি জানে ভালবাসা বা স্বপ্ন কী? গীতির শরীরের পরিচিত পারফিউমের গন্ধ কি ছিল? অনেক অনেক দিন সে কোনও মেয়েমানুষের সামনে দাঁড়ায়নি। নির্দিষ্ট সাক্ষাতের সময় শেষ হলে গীতি তো চলে যাবে তখন এই করুণার গন্ধের ভিতর তার তো কিছুই করবার থাকবে না। 'ঝুলনকে আনতে পারতে' বলে সে নিস্তব্ধতা ভাঙে। আজ কিন্তু এ প্রশ্ন করেনি। বেশ কিছুক্ষণের জন্য সে এক আশ্চর্য অনভূতিতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেই কি মাছটিকে শ্বাসরোধ করেছে? অনেকক্ষণ মাছটিকে স্বচ্ছ জলের ভিতর লক্ষ করে নিজের হাতটিকে দেখতেই থাকে কেননা আরও একটি হত্যা কি সত্যি সত্যি সংঘটিত হয়ে গেল পৃথিবীতে?

পরিত্যক্ত বাড়িটির বাসযোগ্যতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল গীতি। বিয়ের পর দিন কয়েকের জন্য এসেছিল—পৈত্রিক ভিটেতে আসতেই হয়। আত্মীয়স্বজনেরা তখনও ছিল। এখন অবশ্য কেউ নেই—সকলেই শহরে উঠে গেছে। নকুলদা সেদিন চলে যাবার পর কথার বেসুরো ভাবটির রেশ অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে সর্পিণীর মতন ঘুরে বেড়িয়েছে। গীতি যেন টের পেয়ে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে—তারই মধ্যে শান্তনুর গলায় ঠাট্টা লাফিয়ে ওঠে—'শর্তটা কাকে দিল তোমাকে না আমাকে?'

গীতি সেদিন কোনও কথা বলতে পারেনি বা কথার পৃষ্ঠে কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু শরীরের ভিতর দমকা বাতাসে কথাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোনও এক অনুদ্দিষ্ট নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। গীতি কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করে কার্যত ডুকরে ওঠে। দুপুর গড়ালে শান্তনুকে তৈরি হতে দেখে বলে—'আজই যাবে?'

প্রথম কিস্তির ঝড়ের পর ধুলোর আস্তরণ আকাশের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারের ফলে চতুর্দিকের ঘোলাটে ভাবের মধ্যে ঝপ করে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কোনও বাসের দেখা এখন পর্যন্ত নেই—এখানে এক্সপ্রেস, লিমিটেড থামে না। ঝড়ে যারা আটকা পড়েছিল তারা বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাবার ফলে দোকানে এখন গীতি একলা। তার বসে থাকার ভঙ্গিতে স্তব্ধতার নিরবচ্ছিন্ন আবহ। সারাদিনে সে বুঝে উঠতে পারেনি মানুষটিকে। ঠিক কী কথা বলা উচিত ছিল? কোথা থেকেই বা শুরু করবে? তাই ছেদহীন প্রশ্নের যে সংলাপ চলছিলই তা এখনও যেন চলছে সন্ধ্যার বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে। সারাদিনে শান্তনু কটা কথা বলেছে তা বোধ হয় হিসাব করা যাবে। তার কি কিছু বলার ছিল? বলার আছে? শান্তনুর স্ত্রী হিসাবে? আকাশের মেঘ তখন কৃষ্ণসারের আকৃতি পেয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটছে, পিছনে যেন ব্ল্যাক প্যান্থার। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহে গেলে দোকানি বলে—'দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেল—'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ লরি চলাচল বন্ধ দেখে দোকানি এবার গীতিকেই বলে—'বাস বোধ হয় আসবে না দেখছেন, না রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই—নিশ্চয় কোনও গোলমাল হয়েছে।'

কথা শেষ হয়ে যাবার পর গীতি উঠে দাঁড়ালে দোকানি আবার বলে—'কোথায় যাবেন?'

ফিরে যাবার কথা, শান্তনুর নাম বলায় তাকে দাঁড়াতে বলে দোকানি দোকান বন্ধ করতে করতে আরও একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলে—'আগে বলবেন তো বৌদি, আপনাকে চিনতেই পারিনি। অনেকদিন পর এদিকে তো—আমি সুবল।'

সাত আট বছর আগেকার কোনও এক সুবলকে গীতি চিনে উঠতে পারছে না। আকাশে তখন প্রথম রাতের উলঙ্গ চাঁদকে ঢেকে রাখবার জন্য মেঘেদের অদম্য প্রয়াসের ভিতর সে লক্ষ করল সামনের পিচ ঢালা রাস্তাটা হঠাৎ হঠাৎ ম্লান জ্যোৎস্নায় নদীর আদল পেয়ে যাচ্ছে।

'কেমন সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে'—সুবলের গলায় আক্ষেপ ফুটে ওঠে কিন্তু তারা কেউ চলা থামায় না। গীতি ফিরে এসে দেখে সদর থেকে শুরু করে সমস্ত দরজাই সে রকমই খোলা।

এভাবেই থাকে নাকি প্রতিদিন? আর শান্তনু এমন এক ভঙ্গিতে বসে যেন ঘরের কোনও অলৌকিক কোণে কোনও সর্পিণী লুকিয়ে আছে!

যখন নিঃশব্দ শব্দরে খাবে
তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে।

সুবলের কন্ঠে গুনগুনিয়ে উঠতেই গীতির মনে পড়ে গেল এই মানুষটি শান্তনুর কাছে আসত সদ্য বাঁধা গান নিয়ে। এই মুহূর্তে বিশ্ব প্রকৃতি যখন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে দ্রুত তারই মধ্যে গানের সুর গাঢ় ধাতুর তরলের মতন গড়িয়ে গিয়ে জমাট বেঁধে ছাঁচে পড়ে কোন মূর্তি তৈরি হয়ে যাচ্ছে কে জানে? প্রবল শব্দে কাছে কোথাও বজ্রপাতের বিদ্যুৎ চমকে সমস্ত বাড়ির সঙ্গে আলোকিত গীতিকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শান্তনু।

'বৌদিকে রেখে গেলাম' বলে সুবল ফিরে যাবার পরও মেঘের আওয়াজ বহু দূর পর্যন্ত সরে গেল।

গীতি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল—'গাড়ি নেই, ফিরে এলাম।' রাত একসময় আরও গভীর হলে বিশ্বসংসার আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে—অসহ্য স্তব্ধতা বাড়ছে রাতের গভীরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তখনই গীতির অনেক কাছাকাছি চলে আসে শান্তনু। সেই পারফিউমের ঝিম মেরে থাকা চেনা গন্ধে যখন বুক ভরে যাচ্ছিল গীতি আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমরা কিন্তু সাবধান নই, যদি কেউ এসে পড়ে আবার পৃথিবীতে নতুন কেউ এসে পড়ে যদি?' গীতিকে বাধা দিতে হয় না, অসীম শূন্যতা মাখা সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আলিঙ্গন মুক্ত করে দিচ্ছে—এই ভাবে খুউব ধীরে গীতির কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালে মনে হয়, কেউ এত দিনে নির্দেশ করছে বেশ তা হলে নিজেকেই খাও। শান্তনু কি পা থেকে শুরু করে খেতে খেতে ওপরে উঠে যাবে? তখন তার উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কি বলে উঠবে—জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর চেয়ে বড় নজির আর নেই।

প্রবল বর্ষণে মাছ চাষের চৌবাচ্চা দুটি ভর্তি হয়ে গেলে মৃত মাছটি বাড়তি জলের স্রোতে বেরিয়ে যাবার মুখে বার বার আটকে যাচ্ছে কিন্তু তাকে অতিক্রম করে চৌবাচ্চার সমস্ত মাছই স্রোতের টানে বাইরে উঠোনে। এ রকম আয়োজনের মধ্যে গীতি ও শান্তনু একই সঙ্গে একসময় বলে ওঠে—'ঝুলনটা একা একা কী করছে কে জানে—'